প্রসঙ্গ শিক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষার অধিকার

সরকার, সমাজ ও এনজিও সহযোগিতা অপরিহার্য

ড. মনজুর আহমদ

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক অগ্রগতি অবিসংবাদিত। ভর্তির হার বেড়েছে। ছেলেমেয়ের অংশগ্রহণের পার্থক্য কমে এসেছে। কিন্তু সর্বজনীন মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষার অধিকার বাস্তবায়নের জাতীয় লক্ষ্য এখনও রয়ে গেছে বহু দূরে। প্রাথমিক শিক্ষার ছয় থেকে দশ বছরের নির্ধারিত বয়সসীমার শিশুদের এক-চতুর্থাংশেরও বেশি এখনও থাকছে বিদ্যালয় চত্বরের বাইরে। যারা স্কুলে নাম লেখায় তাদেরও অন্তত এক-তৃতীয়াংশ শেষ পর্যন্ত স্কুলে টিকে থাকে না। মান ও অর্জিত বিদ্যার নিরিখে পরিস্থিতি হতাশাজনক। প্রাথমিক পর্যায়ের শেষে সরকারী পরীক্ষার ব্যবস্থা নেই। তবে সরকারী বৃত্তি পরীক্ষায় প্রতি স্কুল থেকে বাছাই করা কিছু ছাত্রকে পাঠানো হয়। এই পরীক্ষায় প্রতি চারজনে বা তিনজনে মাত্র একজন পাসের নম্বর পায়। অবশিষ্ট সাধারণ ছাত্রদের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। সাম্প্রতিক কিছু নমুনা জরিপে দেখা গেছে--ভাষা, অঙ্ক ও সাধারণ জ্ঞানে নিম্নতম গ্রহণযোগ্য দক্ষতা অর্জন করতে পেরেছে এক-তৃতীয়াংশেরও কম শিশু।

প্রাথমিক পর্যায়ে সরকারী স্কুল ছাড়াও রয়েছে সরকার অনুমোদিত বেসরকারী বিদ্যালয় এবং স্থানীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত কমিউনিটি স্কুল। অনুমোদিত স্কুলগুলোর জন্য ক্ষেত্রবিশেষে শিক্ষকদের ব্যয়ের শতকরা ৯০ ভাগ সরকার বহন করে। কমিউনিস্ট স্কুলে দু'জন বা তিনজন শিক্ষকের জন্য মাসিক কিছু ভাতা ছাড়া অন্য সরকারী সাহায্য দেয়া হয় না।

বাংলাদেশে বর্তমানে রয়েছে ৩৮ হাজার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২৩ হাজার অনুমোদিত বিদ্যালয় ও প্রায় তিন হাজার কমিউনিটি স্কুল। কমিউনিটি স্কুলের মান ও পরিবেশ নির্ভর করে স্থানীয় প্রতিষ্ঠাতাদের সৎ চেষ্টা ও সদিচ্ছার ওপর। উদ্যোক্তাদের অনেকের আশা, এগুলো ভবিষ্যতে সরকারী না হলেও সরকার অনুমোদিত স্কুলে রূপান্তরিত হবে। অনেক ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাদের প্রাথমিক উৎসাহ স্তিমিত হয়ে গেলে এগুলো অচল হয়ে যায়।

এভাবে বন্ধ হওয়া বা বন্ধ হওয়ার উপক্রম প্রায় দু' শ' স্কুলকে এনজিওদের হাতে হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। উদ্দেশ্য, যদি এনজিওরা এগুলো অন্তত দু' বছর ঠিকভাবে চালাতে পারে তাহলে সরকারী অনুদানের সাহায্যে স্থানীয় সমাজের তত্ত্বাবধানে ভবিষ্যতেও এগুলো ভালভাবে চলবে।

দু' শ' অচল কমিউনিটি স্কুলের মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রণী ব্র্যাককে ৭৩টি স্কুলের দায়িত্ব দেয়া হয় দু'বছর আগে। এগুলোর মধ্যে দেখা যায় বেশ কয়েকটির কোন অস্তিত্বই ছিল না। আরও কয়েকটি ক্ষেত্রে স্থানীয় সমাজের পক্ষ থেকে যথেষ্ট উৎসাহ বা সাড়া পাওয়া যায়নি। ব্র্যাক শেষ পর্যন্ত ৪৩টি স্কুল চালু করতে সক্ষম হয়। এগুলোর মোট ছাত্রসংখ্যা ৫২০০ এবং শিক্ষক সংখ্যা ১৪৩ জন।

ব্র্যাক ও স্থানীয় সমাজের সহযোগিতায় ইতোমধ্যে স্কুল ইমারত, পানির ব্যবস্থা, শৌচাগার, সংযোগ সড়ক ইত্যাদির উন্নয়ন করা হয়েছে। নতুনভাবে শিক্ষক নিয়োগ করে ব্র্যাকের শিক্ষা প্রথা অনুযায়ী প্রাথমিক ও পৌনঃপুনিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অন্তত এসএসসি পর্যন্ত শেষ করার যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকদের শতকরা ৯৫ ভাগই মহিলা। তাদের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষকদের মতো মাসিক ৬২৫ টাকা ভাতা দেয়া হয়। সরকারী পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও অতিরিক্ত পুস্তক ও উপকরণের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের অগ্রগতির অব্যাহত মূল্যায়ন করা হয়। তাছাড়া পূর্বনির্ধারিত ব্যবস্থায় বছরে তিনবার পরীক্ষা নেয়া হয়। প্রতি শ্রেণীকক্ষে ছাত্রসংখ্যা ৩০ থেকে ৩৫-এর মধ্যে রাখা হয়। অভিভাবক ও স্থানীয় সমাজ স্কুলগুলোর সাহায্যে এগিয়ে এসেছে। নয়টি স্কুলে নতুন শ্রেণীকক্ষ তৈরি করা হয়েছে স্থানীয় সহায়তায়। সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত স্কুলগুলোর কার্যকলাপে ও শিক্ষা তৎপরতায় সকলে, বিশেষত অভিভাবকরা সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

ব্র্যাক ও স্থানীয় সমাজের সহযোগিতায় কমিউনিটি স্কুলগুলো আবার সজীব হয়ে উঠেছে--এটা আশ্চর্য কিছু নয়। আশ্চর্য যে সরকার, সমাজ ও এনজিওদের এই সহযোগিতার পরিসর অত্যন্ত সীমিত এবং এটি একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা। এই প্রকল্পের ব্যয়ও এনজিওরাই সম্পূর্ণভাবে বহন করছে।

স্বেচ্ছাসেবী এনজিওরা সমাজের দরিদ্রতম অংশের শিশুদের কাছে শিক্ষার আলো পৌছানোর কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। শিক্ষায় সংশ্লিষ্ট এনজিওদের সমিতি ক্যাম্পের (বাংলায় সার্বিক সাক্ষরতা অভিযান) সদস্য প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় চার শ'। এগুলোর মধ্যে ব্র্যাকের শিক্ষা কার্যক্রম সবচেয়ে ব্যাপক। ত্রিশ হাজার ব্র্যাক পাঠশালায় দশ লক্ষাধিক বঞ্চিত কিশোর-কিশোরী প্রাথমিক শিক্ষার প্রথম তিন বছরের সমতুল্য শিক্ষায় সফলভাবে অংশগ্রহণ করছে। ব্র্যাকের শিক্ষা উদ্যোগ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

কিন্তু এনজিওদের প্রাথমিক শিক্ষাসংক্রান্ত কাজ সরকারী উদ্যোগের সঙ্গে সমান্তরালভাবে চলছে। এই দুই রেখা কোথাও পরস্পরকে স্পর্শ করে না, এমনকি প্রাথমিক শিক্ষাসংক্রান্ত সরকারী অর্থে ব্র্যাকের ৩০ হাজার শিক্ষা কেন্দ্র ও দশ লাখ শিশুর হিসাব উল্লেখ করা হয় না। যেন এদের অবস্থিতি অন্য কোন গ্রহে। একইভাবে বেসরকারী প্রচেষ্টায় সরকারী সহযোগিতার হাত বাড়ানো হয় সে সব ক্ষেত্রেই যেখানে সরকারী কার্যক্রমের প্রতিবিম্ব হিসাবে বেসরকারী উদ্যোগ পরিচালিত হয়। সরকার অনুমোদিত বেসরকারী প্রাইমারি স্কুলগুলো এর একটি উদাহরণ। সরকারী ব্যবস্থার সবরকম দুর্বলতা তো রয়েছেই এসব স্কুলে। তার সঙ্গে আছে সরকারী স্কুলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শিক্ষক নিয়োগ ও ব্যবস্থাপনার মানের ক্ষেত্রে শৈথিল্য। এনজিওদের নিজস্ব উদ্যোগে ব্যতিক্রমী বা সৃজনশীল প্রচেষ্টাকে আমলারা ও সরকারী শিক্ষা দফতর সন্দেহ, বৈরিতা বা নিদেনপক্ষে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখতে অভ্যস্ত--নিরপেক্ষ মূল্যায়নের বিচারে এসব প্রচেষ্টার ফল যাই হোক।

এ কথা সুস্পষ্ট যে, শিক্ষা থেকে বাদ পড়ছে বা নিম্নতম দক্ষতা অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছে তারাই, যারা দরিদ্রতম দূর পল্লী বা শহরে বস্তির বাসিন্দা এবং বিভিন্নভাবে সমাজের নিগৃহীত ও লাঞ্ছিত অংশ। সাধারণ সরকারী বা বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ তারা গ্রহণ করতে পারে না দারিদ্র্য, পারিবারিক পরিস্থিতি ও সমাজে তাদের অবস্থানের জন্য।

প্রাথমিক শিক্ষায় ছাত্রভর্তির সংখ্যা বাড়ানোর কাজটি ছিল অপেক্ষাকৃতভাবে সহজ। শিক্ষার মান উন্নয়নের কাজ জটিল। তেমনি দুরূহ যারা এখনও বাইরে রয়েছে। তাদের সকলকে শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসা। কারণ এরা দরিদ্রতম এবং নানা দিক থেকে চরমভাবে বঞ্চিত।

গতানুগতিকভাবে বর্তমানে চালু সরকারী বা অনুমোদিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বা আকার বাড়ালেই শিক্ষার মান উন্নয়ন করা বা সমাজের বঞ্চিতদের কাছে পৌছানো যাবে না। এ জন্য প্রয়োজন সামগ্রিকভাবে সহযোগিতার পরিবেশের ও মনোভাবের। সরকার, স্থানীয় সমাজ, বৃহত্তর সুশীল সমাজ ও শিক্ষায় ব্যাপৃত স্বেচ্ছাসেবী ও এনজিও প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঐক্যবদ্ধভাবে পদক্ষেপ নিতে হবে এ জন্য। শিক্ষা কার্যসূচী, বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা ও স্থানীয়ভাবে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সকলকে কাজ করতে হবে একযোগে। শুধু সরকারী প্রচেষ্টায় সাফল্য অর্জিত হবে না, বিশেষত যখন সরকারী কার্যকলাপ অতিমাত্রায় কেন্দ্রীভূত ও আমলাতান্ত্রিকতার বেড়াজালে আবদ্ধ। দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতার বোধ ও আচার সৃষ্টির জন্যও সকলের সমবেত চেষ্টা প্রয়োজন।

শিক্ষা দফতর ও বিভাগের উর্ধতন কর্মকর্তাদের অনেকের মতে, প্রাথমিক শিক্ষার সামগ্রিক দায়িত্ব যেহেতু সরকারের, এখানে অন্য কারও, বিশেষত এনজিওদের কোন ভূমিকা নেই এবং থাকাও সমীচীন নয়। এই মনোভাব থেকেই সহযোগিতার ব্যাপারে তারা উৎসাহী নয়। তারা সম্ভবত মনে করে, কিছু অচল কমিউনিটি স্কুলের দায়িত্ব এনজিওদের হাতে দিয়ে এনজিওদের অনুগ্রহ করা হয়েছে।

প্রগতিশীলতার দাবিদার বাম রাজনীতির প্রতি সহানুভূতিশীল শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদদের এক অংশও মনে করে, প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সরকারের সামগ্রিক দায়িত্ব মানে এ ক্ষেত্রে আর কারও কোন ভূমিকা নেই। সকল প্রাথমিক স্কুলকে জাতীয়করণের মাধ্যমে সম্পূর্ণ সরকারের এখতিয়ারভুক্ত করার দাবিও মাঝে মাঝে শোনা যায়। তাঁরা ভুলে যান বাংলাদেশের মতো পোস্ট ফিউডাল অর্ধগণতান্ত্রিক সমাজে সরকার স্বল্পসংখ্যক স্বার্থগোষ্ঠীর কব্জায়। নিগৃহীত সাধারণ নাগরিকের স্বার্থরক্ষার উপায় প্রশস্ততর হতে পারে বহুমুখী প্রচেষ্টায়, সমাজের বিভিন্ন অংশের উদ্যোগের মাধ্যমে এবং সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে-- সরকারের একক ও পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নয়।

[লেখক ইউনিসেফের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষা উপদেষ্টা]